ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 128-137
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.188

স্থানীয় ইতিহাস চর্চায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুমিত পাল, *গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
রঞ্জনা ব্যানার্জি, *অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
সমীররঞ্জন অধিকারী, *অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সিধো-কানহু-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 01.09.2025; Accepted: 11.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The literary works of Jatindra Mohan Bagchi hold immense value in reconstructing the regional history of Nadia, serving as cultural and historical documents for both present and future generations. His writings provide vivid portrayals of the socio-economic and cultural life of his time, particularly the experiences of common people, the struggles of rural women, and the socio-political realities shaped by zamindars and colonial authorities. Bagchi's depiction of the peasants' oppression by British police during the forced indigo cultivation stands as a striking testimony to a painful phase of colonial history.

Equally noteworthy are his detailed descriptions of Nadia's geographical landscape and archaeological heritage, with references to ancient villages, monuments, and age-old traditions. His essays record rural festivals and fairs, such as Durga Puja, along with accurate accounts of village economy and livelihoods. He further explored communal relationships between Hindus and Muslims, acknowledging tensions while emphasizing harmony and brotherhood.

Bagchi also preserved aspects of folk culture, including village women's rituals like the Punya Pukur and the lost Jam Pukur festival. His references to folk songs, particularly the Ekdil Pir's song, enrich the cultural fabric of Bengal and highlight the oral traditions of the region. Moreover, his documentation of religious conversions in areas like Shikarpur adds another important layer to Nadia's history. Through his portrayal of ancient places, rivers, festivals, and rural life, Bagchi crafted a comprehensive narrative that affirms his enduring contribution to Bengali literature and regional historiography.

Keywords: Regional history, folk culture, colonial oppression, Nadia district, Bengali literature

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মস্থান নদিয়া জেলার করিমপুর সংলগ্ন যমশেরপুর গ্রাম কোনো ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কিংবা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদ নয়। এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন কৃষিনির্ভর সাধারণ চাষাভুষো। তৎকালীন সময়ে এখানে বড় কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য বা কলকারখানা গড়ে ওঠেনি, আজও নেই। ফলে স্থানীয় মানুষের একমাত্র প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ এবং অল্পসংখ্যক মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য মৎস্যশিকার করতেন, যা এখনও সামান্য

আকারে প্রচলিত আছে। এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে মূলত জলঙ্গী- কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কই ভরসা ছিল, যা এখনও বিদ্যমান। তবে রেল যোগাযোগের সুবিধা তখনও অনুপস্থিত ছিল এবং আজও এই অঞ্চলে তা অনুপস্থিত (মজুমদার, 1985; সরকার, 2008)।

এমন প্রান্তিক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেও যতীন্দ্রমোহন তাঁর স্থানীয় এলাকার ইতিহাস নির্মাণে অসামান্য ভূমিকা রাখেন। তিনি জমিদার পরিবারে জন্ম নিয়েও অত্যন্ত সাধারণভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন। জমিদারি আয়ে টিকে থাকা সম্ভব না হওয়ায় তিনি কলকাতায় বসবাস শুরু করেছিলেন। তবুও তিনি তাঁর জন্মভূমিকে কখনও ভোলেননি এবং বারবার টান অনুভব করে গ্রামে ফিরে এসেছেন।

যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্য কেবল সাহিত্যিক নান্দনিকতায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তাতে গ্রামীণ অর্থনীতি ও করিমপুর এলাকার কৃষিজীবনের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত করে এবং কৃষক সমাজ দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়। একই সঙ্গে তিনি নদীবহুল অঞ্চলের কৃষি সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতার বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। পদ্মা ও জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের ভৌগোলিক পরিবেশ, কৃষি উৎপাদনের উপযোগিতা এবং বিশেষত নীলচাষের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (চক্রবর্তী, 1992)।

তাঁর রচনায় গ্রামীণ সমাজ, আঞ্চলিক ইতিহাস, কৃষিজীবন, শিল্প-সংস্কৃতি ও স্থানীয় জীবনের নানাদিক প্রতিফলিত হয়েছে। করিমপুর সংলগ্ন যমশেরপুর ও আশেপাশের জনপদের ইতিহাস-সংস্কৃতি জানতে যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্যকীর্তি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর '*পল্লীকথা*' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন—

> "দেশের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় পল্লীর ইতিহাসও প্রয়োজনীয়। বিন্দু বিন্দু ফুলের মধু লইয়া মধুচক্র রচিত হয়, তথাপি এ ইতিহাসও একদিন অতীতের ইতিহাসে পরিণত হইবে এবং পল্লীকাহিনী হইলেও দু'চারটি নতুন কথা শুনাইতে পারে।" (বাগচী, 1910/1995, পৃ. 47)

এই বক্তব্য থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর ইতিহাসচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্থানীয় ইতিহাস। শিক্ষাবিজ্ঞানগত দৃষ্টিতে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসচিন্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো—কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসভাবনার সেকাল ও বর্তমান কালের প্রভাব পর্যালোচনা করা। এই গবেষণা স্থানীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা ও সাহিত্যিক প্রভাব বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গবেষণা প্রশ্ন:

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসভাবনার সেকাল ও বর্তমান কালের প্রভাবের ক্ষেত্রে মূল প্রশ্নটি হলো—

> "কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাসভাবনার সেকাল ও বর্তমান কালের প্রভাব কী?"

গবেষণা পদ্ধতি:

বর্তমান গবেষণাটি ঐতিহাসিক গবেষণা। এখানে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Method) অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণায় বিশেষভাবে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) প্রয়োগ করা হয়েছে, যা গবেষণার বিষয়বস্তুর গভীর ও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণকে সম্ভব করে তোলে।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি:

গবেষণা পরিচালনার জন্য উপাত্ত সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সংগৃহীত উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে তথ্য আহরণ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপাত্তকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে— প্রাথমিক উপাত্ত ও গৌণ উপাত্ত।

(অ) প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Data):

প্রাথমিক উপাত্ত হিসেবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্বরচিত গ্রন্থসমূহকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— *লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী* ইত্যাদি।

(আ) গৌণ উপাত্ত (Secondary Data):

গবেষণায় ব্যবহৃত গৌণ উপাত্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—

- যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবন সম্পর্কিত তথ্য,
- তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন লেখকের আলোচনা,
- যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থ,
- বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক লেখা,
- মুদ্রিত ও অমুদ্রিত নথিপত্র।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ:

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকৌশল, যার মাধ্যমে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত এবং বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে সংগৃহীত গৌণ উপাত্তকে নিরপেক্ষ ও প্রণালীবদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করা হয় (Krippendorff, 2019) । এই পদ্ধতিতে সামাজিক নিদর্শন, শিল্পকর্ম, বই, চিঠিপত্র, জার্নাল, চিত্রকর্ম, সংবাদপত্র, মৌখিক উপস্থাপনা এবং লিখিত ডকুমেন্ট ইত্যাদি গবেষণার উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় (Neuendorf, 2017) ।

বিষয়বস্তুবিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায় যে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকীর্তিতে আঞ্চলিক ইতিহাস, গ্রামীণ জীবন-জীবিকা, স্থানীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক বর্ণনা উঠে এসেছে, যা ইতিহাসচর্চার প্রামাণ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তদুপরি, ক্ষেত্রসমীক্ষা ও পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্ত পূর্বে বিশ্লেষণপদ্ধতিতে পরীক্ষা করে তথ্য ও সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল:

গবেষণার সমাপ্তি মূলত গবেষণা-ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তথ্য উন্মোচিত হয়, তার ভিত্তিতেই গবেষণার ফলাফল নির্ধারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সঠিক উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ওপর গবেষণার চূড়ান্ত ফলাফল নির্ভরশীল।

স্থানীয় ইতিহাস অন্বেষণে যতীন্দ্রমোহন বাগচী:

যেকোনো পল্লীগ্রামেই অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান মেলে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ইতিহাসপাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্ম থেকে আমরা তাঁর জন্মভূমি নদিয়ার করিমপুর এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল—যেমন যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোঁড়াদহ, সুন্দলপুর, আরবপুর ও বাজিতপুর-চেঁচানিয়া প্রভৃতির স্থানীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি।

যমশেরপুরে বাগচী জমিদার পরিবারের পারিবারিক ঐতিহ্য, ঐ এলাকার ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা, দুর্গাপূজা-সহ স্থানীয় উৎসব ও মেলার বিবরণ, গ্রামীণ জীবনযাত্রা, কৃষিকাজ, প্রাচীন স্থাননাম, স্থানীয় ভাষা এবং অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ইত্যাদির বিশ্লেষণ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে (Majumdar, 2008) ।

যতীন্দ্রমোহনের সাহিত্যকর্মে স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশের পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, ধোঁড়াদহ গ্রামের চৌধুরী জমিদার পরিবারের মন্দির, সুন্দলপুরের মন্দির, শান্তিরামপুর গ্রামের গির্জা ও দোগাছির মসজিদের বর্ণনা তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আজও কঙ্কালসার অবস্থায় টিকে আছে। ধোঁড়াদহ চৌধুরী জমিদারদের পাতালঘর এবং ওয়াটসন কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনো এই অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যায় (Sarkar, 1989) ।

এই সমস্ত নিদর্শন ও তথ্য বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে রয়ে গেছে, যা স্থানীয় ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ইতিহাস ভাবনায়জমিদার পরিবারগুলির উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর রচনায় আমরা প্রথমেই দেখতে পাই স্থানীয় জমিদার পরিবারের উল্লেখ— যেমন বাগচী জমিদার পরিবার, চৌধুরী জমিদার

পরিবার এবং সরকার জমিদার পরিবার। এদের মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে, অধিকাংশ গ্রামীণ সমাজে জমিদার পরিবারগুলি শুধু অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গেও গভীরভাবে যুক্ত ছিল (Bagchi, 1910/2005)।

জমিদার পরিবারের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংকলন স্থানীয় ইতিহাস নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাঁর গবেষণায়ও উল্লেখ করেছেন যে, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে জমিদার পরিবারগুলির অবদান গ্রামীণ সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বোঝার একটি মৌলিক উপাদান হিসেবে কাজ করে। তাই বাগচীর প্রবন্ধে জমিদার পরিবারগুলির নানান উল্লেখ স্থানীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

বাগচী পরিবারের ইতিহাস:

যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর প্রবন্ধে যমশেরপুর গ্রামের জমিদার বাগচী পরিবারের ইতিহাস বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, বাগচী পরিবারের ইতিহাস বৈবাহিক সূত্রে যমশেরপুর অঞ্চলে স্থিতি লাভ করে। পূর্বপুরুষ রামভদ্র বাগচী ১০৫১ বঙ্গাব্দে ঢাকার ধামসহ গ্রাম থেকে সুন্দলপুরে আসেন এবং ১০৫৩ সাল নাগাদ পাকাপাকিভাবে যমশেরপুরে বসবাস শুরু করেন। এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাগচী পরিবারই যমশেরপুরে জমিদারি প্রথার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁদের ইতিহাস স্থানীয় আঞ্চলিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ (বাগচী, ১৯৩৫/2015)।

প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন যে, বাগচী পরিবারের বিস্তার ছিল বহুদূরব্যাপী এবং আত্মীয়-পরিজনের সংখ্যা তিন শতাধিক। পরিবারের বহু সদস্য নায়েবি ও মুহুরিগিরির মতো প্রশাসনিক ও আর্থিক পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও কৌশলের কারণে তাঁরা সমকালীন রাজা-রাজাদের আস্থা অর্জন করেন এবং ধীরে ধীরে উচ্চপদস্থ ও খ্যাতনামা স্থানে অধিষ্ঠিত হন। ফলত তাঁরা ব্যাপক ভূসম্পত্তির মালিক হন এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তার করেন।

এই পরিবারের মধ্যে বহু কৃতী সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামগঙ্গা বাগচী ও সর্বানন্দ বাগচী। রামগঙ্গা বাগচী তাঁর মুহুরিগিরি ও প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে মুর্শিদাবাদের নষীপুর রাজার দেওয়ান হন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন এবং ব্যাপক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। অপরদিকে সর্বানন্দ বাগচী নায়েবি পদে আসীন হয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন (বাগচী, ১৯৩৫/2015)।

প্রাবন্ধিকের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এই পরিবারের ঐতিহ্য আট শতাব্দীর পুরোনো এবং তাঁদের সঙ্গে সমকালীন রাজন্যবর্গের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। এলাকার অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গেও তাঁদের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। জমিদারি ও সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে বাগচী পরিবার বনেদি জমিদার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে স্বীকৃত হয়। আজও স্থানীয় মানুষ বাগচীবাড়ির দুর্গাপূজা দর্শনে আগ্রহী হয়ে ছুটে যান, যা তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাবের ধারাবাহিকতার নিদর্শন। গবেষকও প্রতিবছর সেই দুর্গোৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

চৌধুরী জমিদার পরিবার – ধোঁড়াদহ গ্রামের ঐতিহাস্য:

চৌধুরী জমিদার পরিবারের ধোঁড়াদহ গ্রামের শাখা বহুকালজীবী ও গৌরবময়। গ্রামের অবস্থান—জলঙ্গীনদীর তীর—চৌধুরীবংশের প্রাচীন জমিদারদের ইতিহাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

তাঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন নবাবী তহশীলদার, যার প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল। গ্রামের চৌধুরী পরিবারের একটি ঐতিহাসিক মন্দির আছে এবং একই বাড়ির অভ্যন্তরে অন্তর্গত 'পাতাল ঘর' বিশেষ আকর্ষণীয়, যা ৯১৭ শকাব্দে নির্মিত হয়েছিল।এই ধরনের উপাদান বৃহত আঞ্চলিক ইতিহাসে অনুসন্ধান এবং সৃজনশীল জ্ঞানে প্রাণবন্ততা আনে।

সরকার জমিদার পরিবার:

সুন্দলপুর অঞ্চলে কায়স্থবংশীয় সরকার পরিবারের জমিদারিত্বের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এ পরিবারের সদস্যরা দান-ধ্যান, অতিথিসেবায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং তাঁদের নিজস্ব নীলকুঠিও বিদ্যমান ছিল। পরিবারকে কেন্দ্র করে একটি সাংস্কৃতিক বলয়ও গড়ে ওঠে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, 'জগন্নাথদেবের গুজবাটী'র অনুকরণে এই পরিবার একটি উদ্যান নির্মাণ করে, যার নাম দেওয়া হয় **'গুঞ্জবাটী'**। এখানে দোলযাত্রা, পূজার্চনা, দান-ধ্যান, অতিথি আপ্যায়নসহ নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সরকার জমিদার পরিবারের খ্যাতি সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে (রায়, ১৯৯৪)।

সরকার পরিবারের শ্যামসুন্দর সরকার বিশেষভাবে উদারতা ও দানশীলতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি পরিবারের বিপুল সম্পত্তির একটি বড় অংশ দান করেন এবং এই ঐতিহ্য রক্ষার মধ্য দিয়েই পরিবারটি সমাজে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে (মজুমদার, ২০০২) ।

এ অঞ্চলের অন্যান্য প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের সঙ্গেও তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। যেমন, আরবপুরের স্যান্যাল পরিবার, যারা প্রাচীন জমিদার বংশভুক্ত, বাগচী জমিদার পরিবারের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রাখতেন। এমনকি আরবপুরে পানীয় জলের অভাব দূরীকরণেও বাগচী পরিবার উদ্যোগী হয়েছিল, যার উল্লেখ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখায় পাওয়া যায় (বাগচী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ/১৯০৫) ।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে ভৌগোলিক পরিবেশের বর্ণনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের যথাযথ চিত্রায়ণ একান্ত প্রয়োজনীয়। বাগচী তাঁর লেখনীতে এলাকার ভৌগোলিক সীমা, মৃত্তিকার প্রকৃতি, কৃষিকাজের বিবরণ, নদ-নদী ও স্থানীয় জনজাতির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন (বাগচী, ১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ) ।

তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ *পল্লী-কথা* তে নদীয়ার করিমপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ইতিহাস ও পরিবেশের বিবরণ পাওয়া যায়। করিমপুর, যমশেরপুর, শিকারপুর, ধোঁড়াদহ, সুন্দলপুর ও আরবপুর নামক গ্রামগুলির ভৌগোলিক সীমানা, পরিবেশ এবং নদ-নদীর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য তিনি সংরক্ষণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদের প্রাচীন জলঙ্গী গ্রামটির ভৌগোলিক ও সামাজিক গুরুত্ব তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

বাগচী (১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ) লিখেছেন, "নদী সীমান্তে নিদর্শন রেখে চলিতেছে। বহুতর নদী খাত ও খালের সমাহার। অন্যদিকে শিকারপুরের মতো গ্রামগুলিতে মৌসুমী স্রোতনদী এবং স্বাভাবিক সেচব্যবস্থা রয়েছে। এই নদী ও খালের মাধ্যমে কৃষিকাজ এবং সেচের সুবিধা পাওয়া যায়, যা সেই অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে।"

এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছেন, "মেহেরপুর অঞ্চল এবং তদসংলগ্ন এলাকাগুলিতে নদী এবং জলাভূমি ব্যাপক ভূমিকা পালন করিতেছে। করিমপুর থেকে আরবপুর পর্যন্ত নদীর গতিপথ এবং সংযোগস্থলগুলি কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" (বাগচী, ১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ)

উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাগচী তাঁর রচনায় ভৌগোলিক পরিবেশকে কেবল প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবেই নয়, বরং ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর লেখনীতে ভূগোল ও ইতিহাসের সংমিশ্রণে একটি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক চিত্র নির্মিত হয়েছে, যা সেই অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে প্রভাব বিস্তার করেছে (Majumdar, 1950) ।

আঞ্চলিক ইতিহাস বর্ণনায় জাতিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ধারণা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে জাতিভেদ প্রথা একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তিনি বিশেষভাবে হিন্দু সমাজের জাতিগত বিভাজনের দিকটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আলোচনায় দেখা যায়, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজপুতের বাইরেও শূদ্রজাতীয় তিনটি প্রধান গোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল—চণ্ডাল, গণ্ডক এবং কন্নি। এর মধ্যে কন্নি জাতি মূলত সূতরধরের কাজ করত, আর চণ্ডালেরা পান বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিল (বাগচী, ১৯১৮/২০১৭) ।

বাগচীর লেখায় বৈষ্ণব, খ্রিস্টান ও 'কর্তাভজা' সম্প্রদায়ের কথাও পাওয়া যায়। বিশেষত কর্তাভজা সম্প্রদায়, যারা মূলত গোয়ালা জাতি, তাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা অনুপস্থিত ছিল। এই ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর অস্তিত্ব স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে (Ray, 2003) ।

তিনি মুসলমান সমাজ সম্পর্কেও উল্লেখ করেছেন যে, তাদের মধ্যেও জাতিগত ভেদাভেদ বিদ্যমান। মুসলমান সমাজে শেখ, পাঠান ও ফরাজি নামে বিভিন্ন শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। ফরাজি মুসলমানদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল— তারা কাপড় পরিধান করলেও কাছা ব্যবহার করত না, এবং তাদের তুলনামূলকভাবে অধিক ধর্মপ্রাণ হিসেবে চিহ্নিত করা হতো (Ahmed, 1981) ।

প্রাবন্ধিক আরও জানান যে, ধর্মান্তরের ইতিহাস খুব বেশি প্রভাব বিস্তার না করলেও, কিছু ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তর ঘটেছিল এবং সেই ধর্মান্তরিত পরিবারগুলো এখনও অস্তিত্বশীল। তাঁর আলোচনায় ব্রাহ্মণদের প্রতি একটি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ পায়, যেখানে তিনি বিভিন্ন গ্রামের ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চর্চার কথা গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন (Chatterjee, 1993) ।

অতএব, বাগচীর সাহিত্যকর্মে প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ প্রথা, স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির চিত্র সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এটি আঞ্চলিক ইতিহাস ও সমাজগঠনের প্রক্রিয়াকে অনুধাবনের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

আঞ্চলিক ইতিহাস ভাবনায় প্রাচীনতম নাম ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বর্ণনা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে আঞ্চলিক ইতিহাসচেতনার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি স্থানীয় ধর্ম, সমাজ ও ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনার মাধ্যমে অঞ্চলকে সাংস্কৃতিকভাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর লেখায় গোঘাটা, ত্রিহট্ট, গোয়াড়ী, রাইটা, আখরিগঞ্জের আঁধারকোট প্রভৃতি স্থাননাম ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে (বাগচী, ১৯৩০) ।

স্থানীয় ঐতিহ্যের ধারায় মেহেরপুরের 'মুনশেফী চৌকি', কুচাইডাঙ্গায় নবাবি ফৌজের অবস্থান, সুন্দলপুরে জগন্নাথদেবের গুয়াহাটির অনুকরণে গঠিত 'গুয়াহাটি উদ্যান' এবং 'তুলসীবিহারী মেলা' —এসব স্থান ও অনুষ্ঠান আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তদ্রূপ, আরবপুরের সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র চতুষ্পাঠীও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে (মজুমদার, ১৯৫৭; সরকার, ১৯৭৩) ।

বাগচীর সাহিত্যচর্চায় নদীও একটি সাংস্কৃতিক নিদর্শন হিসেবে উল্লিখিত। বিশেষত ভৈরব, হাওলা, মাথাভাঙ্গা, বাচূর্ণী ও জলঙ্গী নদীর উল্লেখ তাঁর আঞ্চলিক ইতিহাসভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে (সেনগুপ্ত, ১৯৮২) ।

এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে ধোঁড়াদহ নিবাসী রামেশ্বর সাহা, নসিপুরের রাজা, বাগচী পরিবারের রামগঙ্গা ও সর্বানন্দ বাগচী, বীরসিংহ সুবেদার, মহারানী স্বর্ণময়ী এবং সুন্দলপুর নিবাসী শ্যামসুন্দর সরকার প্রমুখের নাম স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে ধরা পড়েছে (রায়, ২০০২) ।

গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও জলবায়ুর বর্ণনা:

প্রাবন্ধিক যতীন্দ্রমোহন বাগচীর রচনায় তৎকালীন বাংলার গ্রামীণ জীবনের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর লেখনী থেকে জানা যায়, গ্রামীণ জনজীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি, কারিগরি কাজ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা ছিল প্রধান ভরসা। যেমন, চণ্ডালরা চুন প্রস্তুত, রাজমিস্ত্রির কাজ, এবং ছুতোরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে গণ্ডকরা মুদি দোকান চালাতেন ও চিড়ে প্রস্তুত করতেন। পানচাষও এ অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিকশিত হয়, যা কেবল হিন্দু সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসার লাভ করেছিল (Bagchi, 1916/2004)।

বাগচীর বিশ্লেষণ অনুসারে কৃষিকাজের মূল সংকটের অন্যতম কারণ ছিল জলবায়ুর পরিবর্তন। নদীর পলি জমে যাওয়া, মৌসুমি বন্যার অনুপস্থিতি, এবং জলাশয়ের ঘাটতি কৃষিকে ব্যাহত করেছিল। এর ফলে হেমন্তকালীন ধান চাষ ক্রমশ কমে গিয়ে আউশ ধান চাষই বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। পাশাপাশি রবিশস্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল মুগ ডালের চাষ। আনন্দপুরীর মুগ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং চর অঞ্চলে কলাই চাষও যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল (Chaudhuri, 1951; Bagchi, 1916/2004) ।

তবে বাগচী কৃষকদের অশিক্ষা ও তথাকথিত অলস স্বভাবের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সামান্য প্রচেষ্টাতেই কৃষকরা উন্নত ফলন লাভ করতে পারতেন, কিন্তু অশিক্ষা ও অবহেলার কারণে তারা দিন দিন নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জমিদারি শোষণ। দুর্ভিক্ষের সময় প্রজারা খাজনা দিতে না পারায় জমিদারদের দমন-পীড়নের শিকার হতো, ফলে তাদের দারিদ্র্য আরও ঘনীভূত হতো (Ray, 1979) ।

বাগচীর এসব পর্যবেক্ষণ কেবল অর্থনৈতিক বাস্তবতাই নয়, বরং অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর রচনায় গ্রামীণ উৎসব, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের চিত্র উঠে এসেছে, যা তৎকালীন বাংলার বহুত্ববাদী ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিফলন (Sarkar, 1973) । এভাবে তিনি সাহিত্যিক রচনার মধ্য দিয়ে স্থানীয় ইতিহাস ও পল্লীজীবনের এক বাস্তবধর্মী ছবি অঙ্কন করেছেন।

স্থানীয় উৎসব ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বর্ণনা:

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যকর্মে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি স্থানীয় উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান এবং ব্রতের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের লোকজ ঐতিহ্য ও বিশ্বাসকে বর্ণনা করেছেন (বাগচী, ১৯৩০/১৯৮২) । তাঁর লেখায় বৈশাখ মাসে পালিত '*পুণ্যপুকুর*' উৎসবের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা মূলত অবিবাহিতা কিশোরীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। এই উৎসবে তারা বাড়ির উঠোনে ছোট্ট পুকুর খুঁড়ে, মাটির পুতুল ও ফুল দিয়ে সাজিয়ে পূজা করত। পূজা চলাকালীন তারা একটি ছড়া আবৃত্তি করত—

"পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা— কে জপেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী নিরবধি; সাত ভাইবোন ভাগ্যবতী।
স্বামী শিয়রে পুত্র কোলে, — মরণ হয় যেন গঙ্গাজলে।
জীয়ন্তে না দেখি আত্মবন্ধুর মরণ।
মরে পাই যেন শিবদুর্গার চরণ" (বাগচী, ১৯৩০/১৯৮২, পৃ. ৪২)।

এছাড়া, আশ্বিন সংক্রান্তি থেকে কার্তিক সংক্রান্তি পর্যন্ত কিশোরীরা *'যমপুকুর'* উৎসব পালন করত, যেখানে আরেকটি ছড়ার প্রচলন ছিল—

"হ্যালান চাকলমী ডগমগ করে।
রাজার বেটা পাখি মারে॥
মারুক পাখি ভৈরব বিল।
সোনার কৌটা, রূপার খিল।
খিল খুলতে লাগলো ছড়, আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর।
লক্ষলক্ষ ডাক পড়ে— রাজার মাথার টনক নড়ে" (বাগচী, ১৯৩০/১৯৮২, পৃ. ৪৪)।

বাগচী আরও উল্লেখ করেছেন যে, গ্রামীণ নারীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্রত প্রচলিত ছিল, যেমন *সাবিত্রী ব্রত*। আবার জ্যৈষ্ঠ মাসে *বানভোজন* উৎসবেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রোগব্যাধি দূরীকরণের জন্য *'ছাগবধ প্রথা'* এবং *'পীরের সিন্নি দান'* প্রথাও প্রচলিত ছিল (রায়, ২০০২) । যদিও অধিকাংশ ব্রত ও প্রথা বর্তমানে অবলুপ্ত, তথাপি পীরের সিন্নি দানের রীতি আজও বাংলার কিছু অঞ্চলে বজায়চ রয়েছে (মজুমদার, ২০১০) ।

আধুনিক নগরকেন্দ্রিক জীবনধারা গ্রামীণ জীবনের বৈচিত্র্যকে অনেকাংশে ক্ষয় করেছে। যেমন, *'একদিল পীরের গান'* —একটি লোকসংগীতধারা—আজ প্রায় বিলুপ্তপ্রায়। যদিও কয়েকজন প্রবীণ শিল্পী এখনও যমসেরপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করছেন, তবে এই শিল্পের ধারক-বাহকরা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছেন (সেনগুপ্ত, ১৯৯৫) ।

অতএব, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্য শুধুমাত্র সাহিত্যিক অবদান নয়, বরং আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জন্মভূমি করিমপুর থেকে মহকুমা স্থানান্তরের ইতিহাস:

একদা অবিভক্ত বাংলার নদীয়া জেলা চারটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল—দক্ষিণে রানাঘাট, পূর্বে কুষ্টিয়া, মাঝখানে চুয়াডাঙ্গা এবং উত্তরে করিমপুর। তবে করিমপুর মহকুমার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র দুই বছর; পরবর্তীতে মহকুমা করিমপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মেহেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় (Majumdar, 1942) । অথচ তৎকালীন সময়ে মেহেরপুর

প্রশাসনিক দিক থেকে মোটেই মহকুমা প্রতিষ্ঠার উপযোগী ছিল না। এই স্থানান্তরের পেছনে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকদের গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সাধারণ মানুষকে শোষণের পরিকল্পনা (Sarkar, 2017) ।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, করিমপুর ও এর আশেপাশের অঞ্চল— যেমন শিকারপুর, আঁধারকোটা, হোগলবেড়িয়া, আরবপুর, মামুদগাড়ি, বাজিতপুর, চেঁচানি, আলাইপুর, রামচন্দ্রপুর ও তারাপুর— নীলচাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ছিল। এ কারণে খ্যাতনামা ওয়াটসন কোম্পানি এ অঞ্চলে একাধিক নীলকুঠি স্থাপন করেছিল এবং চাষীদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে জোরপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করত (Ray, 2002)। নীলদর্পণ (Dinabandhu Mitra, 1860/2008) এর মতো সমসাময়িক সাহিত্যকর্ম থেকেও আমরা সেই শোষণের নির্মম চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাই। বর্তমানে এই নীলকুঠির বেশ কিছু নিদর্শন এখনো বিদ্যমান।

উল্লেখযোগ্য যে, করিমপুর মহকুমা থাকাকালীন সময়ে নীলচাষ-প্রবণ এলাকাগুলি মহকুমার প্রধান সংযোগস্থল ছিল। ফলে প্রশাসনিক কেন্দ্র করিমপুরে অবস্থিত থাকলে কুঠিয়ালদের পক্ষে সাধারণ মানুষের ওপর শোষণ চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়াত। এজন্য তাদের স্বার্থে প্রায় ২৮ কিলোমিটার দূরে মেহেরপুরে মহকুমা স্থানান্তরিত করা হয় (Chaudhuri, 1990) । স্থানান্তরের আগে আঁধারকোটা এলাকায় থানা ছিল, যা পরে করিমপুরে সরিয়ে আনা হয় এবং আজও তা বিদ্যমান।

করিমপুর থেকে মহকুমা স্থানান্তরের ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের মানুষ প্রশাসনিকভাবে মহকুমা সদর থেকে দূরে সরে যায়। এর ফলে কুঠিয়ালদের পক্ষে নীলচাষীদের ওপর অত্যাচার চালানো আরও সহজ হয়ে ওঠে। এভাবেই এক সুপরিকল্পিত ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে করিমপুর চিরতরে মহকুমার মর্যাদা হারায়।

আঞ্চলিক ব্যবসা ও অন্যান্য স্থাপনার বর্ণনা:

করিমপুর জলঙ্গী নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় প্রাচীনকালে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কেন্দ্র। নদীপথে নৌকা চলাচলের সুবিদা থাকায় এই অঞ্চল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে, পরবর্তীকালে নদীর প্রবাহ শীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বড় নৌকার চলাচল ব্যাহত হয় এবং ধীরে ধীরে ব্যবসার অবনতি ঘটে (Ray, 2002)

সেই সময় করিমপুর ও সংলগ্ন অঞ্চলে প্রধানত নীলচাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রচলিত ছিল। রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, কারণ অধিকাংশ মানুষ ছিলেন খেটে-খাওয়া সাধারণ কৃষক। এ অঞ্চলে তেমন ধনী সম্প্রদায় বা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্যকেন্দ্র না থাকায় বাণিজ্যের প্রসার সীমিত ছিল (Chakrabarti, 1990) ।

১৮৮৫ সালে লোকাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে জলঙ্গী থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মিত হয়, যা পরবর্তীতে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হয়। আজও সেই সড়কই এ অঞ্চলের প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে (District Gazetteer of Nadia, 1910/1995 reprint) ।

তৎকালীন ব্যবসার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বালিয়াডাঙ্গা ও জিতপুর পালেদের শাঁখার ব্যবসা এবং কেঁচুয়াডাঙ্গা-যমশেরপুর অঞ্চলের তন্তুবায়দের তৈরি মোটা থান, গামছা ও কাপড়ের ব্যবসা। বর্তমানে বালিয়াডাঙ্গা ও জিতপুর পালেদের শাঁখার ব্যবসা টিকে থাকলেও তন্তুবায় সমাজের কারিগররা কালের নিয়মে হারিয়ে গিয়েছেন (Majumdar, 2006) ।

অঞ্চলে প্রাথমিক ডাকঘর স্থাপিত হয় করিমপুরে; পরবর্তীতে ধোঁড়াদহ, শিকারপুর ও যমশেরপুরেও ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মহকুমা শহর করিমপুরে একটি প্রবেশিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যা মহকুমা স্থানান্তরের সঙ্গে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীকালে যমশেরপুর, শিকারপুর ও ধোঁড়াদহে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যা আজও বিদ্যমান (Banerjee, 2014) ।

উপসংহার:

যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর সাহিত্যকর্মে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অনন্যসাধারণ রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক কবি হিসেবেও তিনি তাঁর সময়কার প্রামাণ্য আঞ্চলিক ইতিহাসের অভাব উপলব্ধি করেছিলেন এবং বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বরূপ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছিলেন (বাগচী,

১৯১৮/২০১9) । তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা গবেষণার ক্ষেত্রেও মূল্যবান অবদান রেখে চলেছে (চক্রবর্তী, ২০০৭) ।

বাগচীর লেখনীতে গ্রামীণ ঐতিহ্যের বিশদ বর্ণনা কেবলমাত্র নান্দনিক আনন্দই প্রদান করেনি, বরং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার একটি সুদৃঢ় কাঠামো নির্মাণ করেছে। করিমপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজ সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, ও জীবনধারাকে তিনি সাহিত্যরূপে অমর করে তুলেছেন (দাশগুপ্ত, ১৯৯৫) । তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম কেবল একটি শিল্পসাধনা নয়, বরং আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রথম প্রামাণ্য নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি ঐতিহাসিক চেতনার ক্ষেত্রেও বাগচীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্যকর্ম গবেষকদের জন্য একটি অমূল্য দলিল, যা বাংলার গ্রামীণ জীবন ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে (সেন, ২০১৪) । অতএব, যতীন্দ্রমোহন বাগচী যথার্থভাবেই বাংলা সাহিত্যে এবং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনায় এক বিশিষ্ট কৃতিত্বের দাবিদার।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, অ. (২০০৭) । *বঙ্গীয় আঞ্চলিক সাহিত্য ও সমাজচেতনা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
২. দাশগুপ্ত, শ. (১৯৯৫) । *বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি: ইতিহাস ও সাহিত্য*। কলকাতা: প্রকাশ ভবন।
৩. বাগচী, জ. ম. (১৯০৫/১৩১২ বঙ্গাব্দ) । *পল্লী-কথা*। কলকাতা: মল্লিক প্রেস।
৪. বাগচী, জ. ম. (১৯১৮/২০১9) । *কুসুম*। কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন।
৫. বাগচী, জ. ম. (১৯৩০/১৯৮২) । *বাংলার লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
৬. বাগচী, য. (1995) । *পল্লীকথা* (মূল রচনা প্রকাশিত 1910) । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
৭. বাগচী, য. ম. (১৯৩০) । *বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
৮. বাগচী, য. মো. (১৩১২ বঙ্গাব্দ) । *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
৯. বাগচী, যতীন্দ্রমোহন। (১৯৩৫/2015) । *যমশেরপুরের জমিদার বাগচী পরিবার*। কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন।
১০. মজুমদার, র. (২০০২) । *বাংলার জমিদার সমাজ ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
১১. মজুমদার, র. (২০১০) । *বাংলার গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
১২. মজুমদার, র. চ. (1985) । *History of the freedom movement in India* (Vol. 2) । কলকাতা: ফার্মা KLM।
১৩. মজুমদার, র. স. (১৯৫৭) । *History of Bengal, Vol. II*। কলকাতা: University of Calcutta।
১৪. রায়, স. (২০০২) । *বাংলার লোকাচার ও ব্রতকথা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
১৫. রায়, নৃসিংহপ্রসাদ। (২০০২) । *বাংলার ইতিহাসচর্চা ও ঐতিহ্য*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
১৬. রায়, স. (১৯৯৪) । *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
১৭. সরকার, স. (2008) । *The Swadeshi movement in Bengal: 1903-1908*। নয়াদিল্লি: পার্মানেন্ট ব্ল্যাক।
১৮. সরকার, সুমিত। (১৯৭৩) । *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*। নয়া দিল্লি: People's Publishing House।
১৯. সেন, স. (২০১৪) । *বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ইতিহাসচর্চা*। ঢাকা: সাহিত্য সংসদ।
২০. সেনগুপ্ত, নীরদচন্দ্র। (১৯৮২) । *বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
২১. সেনগুপ্ত, স. (১৯৯৫) । *বাংলার লোকসঙ্গীতের ধারা*। কলকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং।
২২. Bagchi, J. M. (2005). *স্থানীয় ইতিহাস ভাবনা* (মূল রচনা প্রকাশিত 1910 সালে) । কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
২৩. চক্রবর্তী, অ. (1992) । *Rural economy and indigo in Bengal*। দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

২৪. Ahmed, R. (1981). *The Bengal Muslims, 1871–1906: A quest for identity*. Oxford University Press.

২৫. Bagchi, J. M. (2004). *Banglar gramer katha* (Original work published 1916). Kolkata: Dey's Publishing.

২৬. Bagchi, J. M. (2017). *Prabandha Sangraha* (Reprint of 1918 ed.). Kolkata: Sahitya Samsad.

২৭. Banerjee, A. (2014). *History and culture of Nadia district*. Kolkata: Firma KLM.

২৮. Chakrabarti, S. (1990). *Rural society and economy in Bengal (1800–1900)*. Kolkata: Progressive Publishers.

২৯. Chatterjee, P. (1993). *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton University Press.

৩০. Chaudhuri, B. B. (1951). *The Agrarian History of Bengal*. Calcutta: Calcutta University Press.

৩১. Chaudhuri, S. (1990). *Civil Disturbances During the British Rule in India*. Calcutta: Firma KLM.

৩২. District Gazetteer of Nadia. (1910/1995 reprint). Calcutta: West Bengal District Gazetteers.

৩৩. Majumdar, R. C. (1942). *History of Nadia*. Calcutta: University of Calcutta.

৩৪. Majumdar, R. C. (1950). *History of Bengal: From the earliest times to the foundation of Muslim rule*. Calcutta: University of Calcutta.

৩৫. Majumdar, R. C. (2006). *History of Bengal (Vol. II)*. Kolkata: Tulshi Prakashani.

৩৬. Majumdar, R. C. (2008). *History of the freedom movement in India* (Vol. 2). Kolkata: Firma KLM.

৩৭. Mitra, D. (2008). *Nil Darpan* (Original work published 1860). Kolkata: Sahitya Samsad.

৩৮. Ray, R. (2003). *The Felt Community: Commonalty and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism*. Oxford University Press.

৩৯. Ray, R. K. (2002). *Entrepreneurship and industry in India, 1800–1947*. New Delhi: Oxford University Press.

৪০. Ray, R. K. (2002). *The Felt Community: Commonality and Mentality before the Emergence of Indian Nationalism*. Delhi: Oxford University Press.

৪১. Ray, S. C. (1979). *Land Revenue and Peasant Life in Colonial Bengal*. Delhi: People's Publishing House.

৪২. Sarkar, S. (1973). *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*. New Delhi: People's Publishing House.

৪৩. Sarkar, S. (1989). *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*. New Delhi: People's Publishing House.

৪৪. Sarkar, S. (2017). *The Swadeshi Movement in Bengal 1903–1908*. New Delhi: Permanent Black.